XXSE

বন্দে মাতরম

আনন্দবাজার পত্রিকা

[redacted]

৯১ বর্ষ ১৮৬ সংখ্যা বৃহস্পতিবার ৪ আশ্বিন ১৪১৯ কলকাতা

না

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ‘না’ বলিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রীর সংস্কারবাসনা তাঁহার পছন্দ হয় নাই। তাঁহার রাজনীতিতে সংস্কারের ঠাঁই নাই, কলিকাতার বর্তমান গণপরিবহণশূন্য রাজপথ সাক্ষ্য দিবে। তিনি কংগ্রেসকে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জন্য সময় বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। সেই সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি ঘোষণা করিলেন, এই সরকারে আর থাকিবেন না। রাজনীতির মাপকাঠিতে শুক্রবার দুপুর আসিতে এখনও অনেক দেরি। শেষ পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের মন্ত্রীদের পদত্যাগপত্র জমা পড়িবে কি না, সেই জল্পনা অবান্তর। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে বদলান নাই, তাহা সংশয়াতীত। তিনি আদিতে বঙ্গজ বামপন্থী বিরোধী নেত্রী। দেখা যাইতেছে, অন্তেও তাহাই। বঙ্গজ বামপন্থীরা, ক্ষমতার যে পার্শ্বেই থাকুন না কেন, চরিত্রগত ভাবে বিরোধী। নেতিই তাঁহাদের মন্ত্র। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতিক্রম নহেন। তিনি ‘না’-ই বলেন। সংস্কারেচ্ছা প্রকাশ করিয়া মনমোহন সিংহ কোনও অপ্রত্যাশিত বা অ-পূর্ব প্রতিক্রিয়া পান নাই।

তাঁহার প্রতিটি ‘না’-ই যে ভ্রান্ত, তাহা নহে। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পালানিয়াপ্পান চিদম্বরমের ন্যাশনাল কাউন্টারটেররিজম সেন্টার-এর প্রস্তাবে তিনি যখন না করিয়াছিলেন, অথবা তাঁহাকে এড়াইয়া তৈরি করা তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি মানিতে তিনি যখন অস্বীকার করিয়াছিলেন, তখন সেই নেতি যথার্থ ছিল। অন্য দিকে, তিনি যখন কৃষক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের দোহাই পাড়িয়া খুচরা বিপণনে বিদেশি পুঁজির বিরোধিতা করেন অথবা পেট্রোলিয়ামের মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব সর্বান্তকরণে রুখিতে চাহেন, তখন বোঝা যায়, অর্থনীতির যুক্তির সহিত তাঁহার শত যোজন দূরত্ব। কিন্তু তাঁহার অবস্থান ঠিক হউক বা ভুল, দৌড় ওই নেতি পর্যন্তই। তিনি কী চাহেন না, তাহাতে তিনি সংশয়ের অবকাশ রাখেন না। কিন্তু কী চাহেন, সেই প্রশ্নে কুয়াশা অগাধ। তাঁহার পূর্বসূরি বামপন্থীরা অন্তত একটি অলীক স্বপ্নের পশ্চাদ্ধাবন করিতেন। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কৃতিত্ব, তিনি কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার কষ্টকল্পনা ত্যাগ করিয়া শিল্পায়নের একটি পথ নির্দেশ করিয়াছিলেন। সেই পথ সকলের পছন্দ না হইতে পারে, কিন্তু এ কথা কেহ অস্বীকার করিবেন না যে, তাঁহার একটি গন্তব্য ছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোথায় পৌঁছাইতে চাহেন, তাহা এখনও অজ্ঞাত।

অথচ, নেতি হইতে ইতি-তে উত্তরণের বহু সুযোগ তিনি নিজেই তৈরি করিয়াছেন। ন্যাশনাল কাউন্টারটেররিজম সেন্টার-এর বিরোধিতার সময়, অথবা কেন্দ্রের নিকট রাজ্যের জন্য অধিকতর অর্থ দাবি করিবার সময় তিনি সচ্ছন্দে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রকৃত প্রয়োগের দাবি করিতে পারিতেন। সংবিধানে আটকাইলে সংবিধান সংশোধনের দাবিই পেশ করিতে পারিতেন। কেন্দ্র ছাড়িয়া রাজ্যের দিকে তাকাইলেও সেই একই সুযোগের অপচয়। তিনি কোনও মতেই বাসভাড়া বাড়াইবেন না, তাহা বহুঘোষিত। কিন্তু, পরিবহণ নীতি কোথায়? তিনি বলিতেই পারিতেন, গণপরিবহণে জোর দেওয়া হইবে। প্রচুর সরকারি বাস চলিবে, বেসরকারি বাস আরও বেশি। ভাড়া না বাড়ানোয় যত ঘাটতি হইবে, সেই টাকা তিনি রাজকোষ হইতে জোগাইবেন। নীতিটি নিঃসন্দেহে আত্মঘাতী হইত, কিন্তু অন্তত একটি নীতি হইত, নিছক নেতি নহে। আবার, খুচরা বিপণনে বিদেশি পুঁজির (আরও কঠোর অবস্থানে যে কোনও বৃহৎ পুঁজির) বিরোধিতাকে একটি প্রকৃষ্ট ইতিবাচক পরিণতিতে লইয়া যাওয়া সম্ভব ছিল। তাঁহার অধীনে সমবায় মন্ত্রক আছে, কিন্তু সেই মন্ত্রকের কাজ নাই। কৃষি সমবায় গঠনের মাধ্যমে তিনি একটি বিকল্প কৃষিনীতি তৈরি করিতে পারিতেন। ভার্গিস কুরিয়ন বহু পূর্বেই প্রমাণ করিয়াছেন, কৃষি সমবায় শুধুমাত্র আদর্শের ফাঁকা বুলি নহে, তাহা অতি বাণিজ্যসফল একটি বিকল্প হইতে পারে। মোট কথা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও নেতির চৌকাঠ পার হইয়া ইতি-র আঙিনায় পা ফেলিতে পারেন নাই। তিনি যখন নিছক বিরোধী নেত্রী ছিলেন, তখনও শুধু নেতিতে এক রকম কাজ চলিত। এখন তিনি শাসক। এখনও বিরোধীর পোশাক পরিলে তাঁহাকে মানাইবে কেন?

সঙ্কটমোচন?

বিচারবিভাগের সহিত পাকিস্তানের নির্বাচিত সরকারের দ্বন্দ্বের আপাতত নিরসন হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট জারদারির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে মামলা শুরুর জন্য আদালতের নির্দেশে প্রধানমন্ত্রী রাজা পারভেজ আশরফ সম্মত হওয়াতেই এই অবস্থা। তাঁহার পূর্বসূরি ইউসুফ রাজা গিলানি এই প্রশ্নে বিচারবিভাগের বিরাগভাজন হইয়া গদি হারাইয়াছিলেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নিজের গদি বাঁচাইতে পারিয়াছেন। কিন্তু ইহার ফলে কি স্বয়ং প্রেসিডেন্ট জারদারির গদি এবং শাসক দল পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টির ক্ষমতাও হাতছাড়া হইয়া যাইবে না? ২০০৯ সাল হইতে এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের সহিত টানাহ্যাঁচড়া চালাইবার পর পিপল্‌স পার্টির সরকার দলের সর্বোচ্চ পদাধিকারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা শুরুতে সম্মতিই বা দিল কেন?

পাকিস্তানে পার্লামেন্ট নির্বাচনের লগ্ন ক্রমশ ঘনাইয়া আসিতেছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নওয়াজ শরিফ যাহাতে দুর্নীতির তদন্তে অসম্মতি এবং বিচারবিভাগের সহিত বিরোধের বিষয়দুটিকে নির্বাচনী প্রচারের কাজে ব্যবহার করিয়া পিপল্‌স পার্টিকে কোণঠাসা করিতে না পারেন, তাহা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সম্ভবত এই কারণেই পার্টির এই রূপ সিদ্ধান্ত। সুপ্রিম কোর্টের সহিত এই প্রশ্নে বিরোধের বিষয়টি জনমনেও বিরূপ প্রভাব ফেলিয়াছে। আসিফ আলি জারদারির তরফে বিচারের সম্মুখীন হইতে চাওয়ার সেটাও কারণ। লক্ষণীয় পাক প্রধানমন্ত্রী নিজ দলের প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা শুরু করা বিষয়ে কোনও সুস্পষ্ট অঙ্গীকার করেন নাই, কেবল সুইজারল্যান্ডের সরকারকে অনুরূপ মামলা হইতে নিরস্ত করিয়া পারভেজ মুশারফের সরকার যে চিঠি পাঠাইয়াছিল, সেটি প্রত্যাহার করিতে সম্মত হইয়াছেন। সত্য, এইটুকু না হইলে জারদারির বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা শুরু করাও অসম্ভব। কিন্তু শুধু এই চিঠি প্রত্যাহারই সেই মামলা শুরুর পক্ষে যথেষ্ট নয়।

পাকিস্তানে বিচারবিভাগ বনাম শাসনবিভাগের দ্বন্দ্ব পারভেজ মুশারফের কাল হইতে চলিতেছে। মুশারফকে বিচারবিভাগের বিরোধিতার মাসুল গনিয়া দিতে হইয়াছে রাজনৈতিক নির্বাসনের মধ্য দিয়া। তবে পাকিস্তানের রাজনীতিতে নির্বাসিতদের পুনর্বাসনও কোনও নূতন ঘটনা নয়। জারদারি-বেনজির এবং নওয়াজ শরিফ সকলেই নির্বাসন হইতেই ফিরিয়াছেন। মুশারফের গণতান্ত্রিক বৈধতা ছিল না, পিপল্‌স পার্টির নেতৃত্বের আছে। অন্য দিকে, পাকিস্তানে বিচারবিভাগ সেনা-সমর্থিত। অন্তত সেনা-অফিসারদের দুর্নীতি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের তহবিল লুণ্ঠন ইত্যাদি লইয়া পাক আদালত বিচলিত হয় না। বিপরীতে নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিভিন্ন দোষত্রুটি খুঁজিয়া বাহির করিতে পাক সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির প্রবল আগ্রহ। এক দিকে সেনাবাহিনী ও বিচারবিভাগের যৌথ চাপ, অন্য দিকে নির্বাচিত রাজনীতিকদের শাসন পরিচালনার উদ্যম— এই দুইয়ের টানাপড়েনে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি আলোড়িত হইতেছে। নূতন এক দফা নির্বাচন সম্পন্ন হইলেই এই আলোড়ন থামিয়া যাইবে, এমন নয়। তবু পাকিস্তানের নবীন গণতন্ত্রকে ইহার মধ্য দিয়াই হাঁটি-হাঁটি পা-পা করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

আর আগুনে যারা পেট্রোল জোগাচ্ছে?

লিবিয়া, ইয়েমেন, সুদান, লেবানন, ইরাক, মিশর। বহু দেশে আগুন জ্বলছে। একটি ‘আপত্তিকর’ ফিল্মের জেরে এই আগুন। যারা আগুন জ্বালাচ্ছে, তারা কত অসহিষ্ণু, তাই নিয়ে দুনিয়ার উদারপন্থী এক হয়েছেন। কিন্তু শুধু তারাই অসহিষ্ণু, আর কেউ নয়? লিখছেন সেমন্তী ঘোষ

মার্টিন রোসন বিলেতের বিখ্যাত কার্টুনিস্ট। ১৬ সেপ্টেম্বর মার্টিন রোসন এক ব্রিটিশ সংবাদপত্রের পাতায় একটি কার্টুন এঁকেছেন: দাউদাউ আগুন, লাল কমলা আগুনবরণ ক্যানভাস, কেবল এক দিকে ছোট্ট একটি পেট্রোল-ক্যান, তার গায়ে আরও ছোট্ট করে লেখা ‘ইনোসেন্স অব মুসলিমস্’। আর ছবির উপর ছোট্ট একটি বাক্য: Whoa! What's their bleedin' problem? — ব্যঙ্গটা স্পষ্ট। এই মুহূর্তে এশিয়া ও আফ্রিকা জুড়ে ‘ইনোসেন্স অব মুসলিমস্’ চলচ্চিত্রের অভিঘাতে যে জিঘাংসা-কাণ্ড চলছে, এবং সেই দেখে পশ্চিম দুনিয়ায় যে প্রতিক্রিয়ার স্রোত বইছে, তা নিয়েই এই কার্টুন।

কী আছে ওই চলচ্চিত্রে? কীসের জন্য এত ক্রোধবহ্নি? ক্যালিফোর্নিয়া-নিবাসী মার্কিন ইসলামবিরোধী নাকুরা বাসেলি নাকুরার তত্ত্বাবধানে বানানো ছবিটিতে দেখানো হয়েছে হজরত মহম্মদ নাকি ক্ষমতালোলুপ, নারীলোলুপ, এমনকী শিশু‘সঙ্গ’লোলুপ। ছবি ইউটিউবে উঠতে যেটুকু সময়— এশিয়া আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়ায় আগুন জ্বলে গেল, পশ্চিমি দূতাবাস, কে এফ সি ম্যাকডোনাল্ডস্ সাহেবসুবো পর্যটকের উপর ঢিল পাটকেল মশাল গুলি গোলা চলল, প্রাণ গেল লিবিয়ার মার্কিন রাষ্ট্রদূতের। এবং আরও এক বার ইসলামের অসহিষ্ণুতার ছিছিক্কারে ভরে গেল বিশ্ব। —আর তারই মধ্যে কি না দুঃসাহসী রোসন এঁকে ফেললেন এই কার্টুন? যে কার্টুন বলছে: ‘পেট্রোল’ও ঢালা হবে এন্তার, আর আগুন জ্বললে অবাক-অবাক প্রশ্ন ছোঁড়া হবে, “বলি হয়েছেটা কী তেনাদের? কিছু অসুবিধে হয়েছে নাকি, অ্যাঁ?”— বলেন কী রোসন? পাঠকরা ফুঁসে উঠছেন। মুসলিমরা আজ যে আগুনে কাণ্ডকারখানা করছে, তার পিছনে পেট্রোল ঢালছে অন্য কেউ, এই কি তাঁর বক্তব্য? সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনার গর্জন: মুসলিমদের আতুপুতু করা বন্ধ হোক! কেন তারা এত স্পর্শকাতর? অন্য দেশে বাক্-স্বাধীনতাতেও তাদের আপত্তি? কেন এই জঘন্য অসহিষ্ণুতাকে পাত্তা দেওয়া?

অসহিষ্ণুতাকে পাত্তা দিতে নেই, তাই, আরও এক ধরনের কার্টুন আঁকা হচ্ছে। ফ্রান্সে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় ভেতরে ‘উলঙ্গ’ মহম্মদের কার্টুন আর উপরে বড় হরফে ব্যঙ্গাত্মক একটি শব্দ: ‘ইনটাচেব্‌লস্’— ধরাছোঁয়ার বাইরে যাঁরা, অর্থাৎ মুসলিমরা, এবং তাঁদের মহম্মদ।

অসহিষ্ণুতা খুব খারাপ জিনিস। কিন্তু কাকে বলে অসহিষ্ণুতা? মুসলিম দেশগুলিতে যা দেখছি আমরা, তাতে বুঝতেই পারছি অসহিষ্ণুতা সেখানে প্রবল। কিন্তু মহামহিম পশ্চিমি দেশগুলি? আগুন না হয় ওরা জ্বালছে, ওরা মারছে, ওরা খারাপ। আর যারা পেট্রোল জোগাচ্ছে, তারা খারাপ নয়? তাদের সব খুন মাফ? মহম্মদকে নিয়ে কোনও চরিত্রচিত্রণই কেন আজও সহ্য করা যাবে না, এটা নিশ্চয়ই জরুরি প্রশ্ন। এই স্পর্শকাতরতা নিশ্চয়ই বাড়াবাড়ি। কিন্তু কেনই-বা মহম্মদকে নিয়েই অনবরত কুৎসিত চর্চা করতে হবে? সেটা বাড়াবাড়ি নয়? সেটাও এক রকম মনোবিকার নয়? ওরা মন্দ কথা সহ্য করতে পারে না, ওরা তাই বাক্‌স্বাধীনতা বন্ধ রেখেছে, ওরা মন্দ। আর এরা যে বাক্‌স্বাধীনতা চালু রেখে নিন্দেমন্দব্যঙ্গরঙ্গ দিয়ে লাগাতার অন্যদের উত্ত্যক্ত করে মারছে, পেট্রোল ঢালছে, সেটা মন্দ নয়?

দুই হাতের মন্দিরা

নাকুরা বাসেলি নাকুরা ভারী গোলমেলে লোক, যত রাজ্যের উগ্র চিন্তা তাঁর মাথায় গিজগিজ করে, যত সব দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর দহরম মহরম, জেলও খেটেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে আপাতত তদন্তে অতি মনোযোগী মার্কিন সরকার। কিন্তু এতগুলি মার্কিন-ব্রিটিশ-জার্মানের উপর আক্রমণ যদি না হত? রাষ্ট্রদূতের নিধন যদি না হত? এই সরকারি দুশ্চিন্তা দেখা যেত কি? দক্ষিণপন্থীরা তাঁদের মনের মাধুরী মিশিয়ে প্রচার করে যেতেন, ছবি বানিয়ে যেতেন, কার্টুন আঁকতেন, মাঝে মধ্যে অবকাশ মতো কোরান পোড়াতেন। বাস্তবিক, মহম্মদকে নিয়ে তাঁদের কালাপাহাড়ি সৃষ্টিশীলতার যে প্রবল প্রস্ফুরণ, যিশু খ্রিস্টকে নিয়ে তো ততটা দেখা যায় না? কিংবা মোজেসকে নিয়ে? ইউরোপ-আমেরিকার এই ‘অন্য’ সৃষ্টিশীলতা কেবলমাত্র একটি ধর্মের প্রতিই সদা আকৃষ্ট— ব্যাপারটা কিন্তু ইন্টারেস্টিং! আর এই সৃষ্টিশীল লোকগুলি যে আবার অবধারিত ভাবে এক ‘অন্য’ রাজনীতির প্রতিও আকৃষ্ট হয়ে পড়েন, সেটাও ইন্টারেস্টিং!

এই যেমন, নাকুরার সঙ্গে বেদম ভাব ফ্লোরিডার সেই যাজক টেরি জোনস্-এর, দুই বছর আগে যিনি তাঁর নিজের তল্লাট গেনসভিল-এ কোরান-পোড়ানোর মহোৎসব পালন করেছিলেন। টেরি জোনস নাকি এই ফিল্মটির ভিডিয়ো-প্রচারেও অত্যন্ত সক্রিয়, মার্কিন তদন্তকারীরা তাঁকে এই প্রচার না করার অনুরোধ জানানোয় জোনস সাংবাদিকদের সোজাসাপটা বলে দিয়েছেন, অনুরোধ রাখতে বয়েই গেছে তাঁর। সরকার কেন যে তাঁকে ‘অনুরোধ’ জানাচ্ছে, কেন যে ‘আদেশ’ বা ‘নির্দেশ’ দিচ্ছে না, সেটা অবশ্য বোঝা সহজ নয়। তবে বোঝা সহজ, ক্যালিফোর্নিয়ার নাকুরা ও ফ্লোরিডার জোনস্— কোন আদর্শের বিনিসুতোয় এঁরা দু’জন গাঁথা। সেই আদর্শের নাম: ইসলামোফোবিয়া। আরও বড় করে বললে, ‘ফার রাইট’ বা ‘অতি দক্ষিণবাদ’। বোঝা সহজ, লিবিয়া ইয়েমেন সুদানের মুসলিমরা তাণ্ডব চালানোয়, মার্কিন নাগরিককে দিনেদুপুরে হত্যা করায় মার্কিন সরকারের এই নড়েচড়ে বসা। নয়তো কোরান পোড়ানোর সময়েও তাদের তত নড়তে দেখা যায়নি কেন? এই অতি-দক্ষিণীরাই উইসকনসিনের গুরুদ্বারে যে হত্যাকাণ্ড ঘটাল, তাতে এমন দেশজোড়া আলোড়ন দেখা যায়নি কেন? কারণ— সেখানেও মার্কিন নাগরিকরাই মারা গিয়েছিলেন বটে, তবে তাঁরা ‘অন্য’ নাগরিক, শিখ অভিবাসী! এই যখন সরকার বা সমাজের পরিস্থিতি, স্বভাবতই, আমেরিকা ইউরোপে এই ‘ফার রাইট’-রা দুধে-ভাতে বেড়ে চলেছেন, ইসলাম-বিরোধিতা আর অভিবাসী-বিরোধিতা দুই হাতের মন্দিরার মতো বেজে চলেছে।

তাই, ৯/১১-র এগারোতম বার্ষিকীতেও কত বিশ্লেষণ, কত চোখের জল, কিন্তু অ্যান্ডার্স বেহরিং ব্রেভিক নামক গণঘাতকের গণহত্যার প্রথম বর্ষপূর্তির দিনটিতেও তেমন তাপ-উত্তাপ নেই নরওয়েতে। কী করেছিলেন ব্রেভিক? তেমন কিছু নয়, কেবল গত বছর ২২ জুলাই অসলো শহরে আট জন, আর অসলোর কাছেই ইউটোয়া দ্বীপে ৬৯ জন ছেলেমেয়েকে একা হাতে মেরে ফেলেন তিনি, যাদের বেশির ভাগই টিন-এজার। ঘোষণা করেন, তাঁর দেশ অভিবাসীদের দাপটে পাল্টে যাচ্ছে, সেই পরিবর্তন রুখতেই তাঁর এই কাজ। নিজেরই ধর্মের মানুষকে মেরে নিজের সরকারকে ধাক্কা দিয়ে অভিবাসন-নীতি (মুসলিম অভিবাসন, অবশ্যই) পাল্টানোর বার্তা।

বিচারের সময় প্রশ্ন উঠেছিল: ব্রেভিক কি পাগল? উত্তর এসেছিল: না, একদম নয়, সম্পূর্ণ সুস্থ। যা করেছেন তিনি, ঠাণ্ডা মাথায় করেছেন। নিশ্চয়ই। রায় বেরোনোর দিনও তাঁর মাথা ভারী ঠাণ্ডা ছিল, মুখে লেগে ছিল এক-চিলতে হাসি, সুস্থ, ঠাণ্ডা সেই হাসি! সত্যি বলতে কী, তাঁর দেশও বেশ ঠাণ্ডা এবং সুস্থ ভাবেই গ্রহণ করেছে ঘটনাটাকে, প্রাথমিক শোক কেটে যাওয়ার পর গত এক বছরে নরওয়ে-তে এ নিয়ে কোনও ক্ষোভ-বিক্ষোভ দেখা যায়নি। বিচারের দিন আদালতে জড়ো হয়েছিলেন বহু নাগরিক, তাঁরাও অদ্ভুত সংযত, চুপচাপ। মজা এটাই। এগারো বছর পরও আল কায়দার সন্ত্রাসের শোক পালন চলে। অভিবাসী-বিরোধী ইসলাম-বিরোধী ব্রেভিকের যে সন্ত্রাস, তার কিন্তু শোক পালন হয় না, সংযমে বিস্মরণে সেই শোক ডুবে যায়।

ব্রেভিক পাগল নন, বরং সুস্থ এবং স্বাভাবিক, এটা খেয়াল রাখলেই এই সংযম ও বিস্মরণের অর্থ বোঝা যায়। ব্রেভিক স্বাভাবিক। তিনি একটি ‘স্বাভাবিক’ ধারার প্রতিনিধি, তাই সেই অসলো-কাণ্ডের পর-পরই ইতালীয় রাজনীতিক মারিয়ো বোর্গেজিয়ো বলেছিলেন, ব্রেভিকের ‘idea’গুলি কিন্তু ‘excellent’। সেই একই ধারার প্রমাণ রেখে এ বছর ব্রেভিকের রায় বেরোনোর পর ফরাসি লেখক রিচার্ড মিলেট বললেন, “ব্রেভিক ইজ হোয়াট নরওয়ে ডিজার্ভস”, সে যা করেছে সেটা ঠিক নয়, কিন্তু যে জন্য করেছে, সেটা নরওয়ের প্রাপ্য, ইউরোপেরও। এই অভিবাসন, এই বহু-সংস্কৃতিবাদ আমেরিকা থেকে আমদানি করেছে ইউরোপ, আর মিলেট-এর মতো লেখক বা বোর্গেজিয়োর মতো নেতার মতে, “ইউরোপের পক্ষে এর মতো খারাপ জিনিস আর হয় না।” নেদারল্যান্ডস-এর গিয়ার্ট ওয়াইল্ডার্সও এই কথাটাই বলে, ‘আই হেট ইসলাম’ ধুয়ো তুলে জনপ্রিয় হয়েছেন। এই ‘লাইন’ নিয়েই ভোটে দাঁড়িয়ে দারুণ সাফল্য পেয়েছে গ্রিসের ‘গোল্ডেন ডন’ দল, কিংবা ২০০২ ও ২০০৭ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়েছেন ফ্রান্সের জঁ-মারি ল্য প্যাঁ। আর এই মুহূর্তে, ইউটিউব আর ফেসবুকে উপচে পড়ছে এঁদের সমর্থন, নব্যপ্রযুক্তিতে তরঙ্গিত হচ্ছে নব্যনাৎসি ভাবধারা।

কেবল অর্থনীতি?

এই নব্যতরঙ্গ নিয়ে তত্ত্ব-রচনাও উথলে উঠছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তত্ত্ব বলছে, অর্থনৈতিক সংকটের জন্যই ইউরোপে অতি-দক্ষিণীদের এই বাড়বাড়ন্ত। তাই কি? গ্রিস যদি এই তত্ত্বের প্রমাণ হয়, নরওয়ে তবে এর অ-প্রমাণ নয় কি? মনে রাখতে হবে, সাম্প্রতিক মন্দাতেও কিন্তু স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলি, বিশেষত নরওয়ে বা সুইডেন এখনও রীতিমত স্থিতিশীল, সংকটবিহীন! এই দেশগুলিতেই আজও সবচেয়ে বেশি পরিমাণ সরকারি জনকল্যাণ-বরাদ্দ, আক্ষরিক ভাবেই এরা কল্যাণ-রাষ্ট্র। কী করে এলেন তবে ব্রেভিকরা? আমেরিকার বিষয়টাও ভেবে দেখার। মন্দা-সংকট সেখানে তীব্র ঠিকই, কিন্তু নাকুরা বা জোনস-রা তো কেবল সেই সংকটেরই সন্তান নন, এঁদের উত্থানের গল্পটা তো আরও আগেকার! ফ্রান্সের ল্য প্যাঁ-রাও তো নিশ্চিত ভাবেই গত কয়েক দশকের নির্মাণ! তাই, শুধু অর্থনীতির তত্ত্ব দিয়েই এই অসহিষ্ণু দক্ষিণবাদকে বুঝলে ভুল হবে। গোটা পশ্চিম দুনিয়ায় সাংস্কৃতিক সংকট, সাংস্কৃতিক ‘উদ্বেগ’ কী ভাবে সহনশীলতার পারদ ছাপিয়ে উঠছে, হিংসায়, অসহিষ্ণুতায় প্রতিফলিত হচ্ছে, সেটা বুঝতে হবে। ব্রিটিশ সাংবাদিক ম্যাথু গুডউইন তাঁর ‘অতি-দক্ষিণবাদের’ উপর গবেষণায় বলেছেন, অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার বদলে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সূত্রেই ইউরোপের দেশে দেশে অতি-দক্ষিণবাদ গাঁথা।

কেবলই কি ইউরোপে? ২০০২-এর গুজরাতও কিন্তু এই রকম একটা প্রশ্ন তুলেছিল। সরকারি প্রযোজনায় যে হিংসার ভয়াবহতা সেখানে দেখেছিলাম আমরা, মধ্যবিত্ত সমাজের সম্পাদনাই তো তার মূল ভরসা ছিল! গুজরাতের মতো বর্ধিষ্ণু অঞ্চলে সেই মধ্যবিত্ত সমাজের প্রোথিত হিংসাভাবের মূলে কি কেবল অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতাই ছিল, আর কিছু নয়?

আসলে ইউরোপ আমেরিকা ভারত, আমাদের সকলের মুশকিল— আমরা ভাবি, ‘ওদের’ সংস্কৃতিটাই অসহিষ্ণু, ‘আমরা’ যুক্তিবাদী। ‘আমরা’ যদি কখনও অসহিষ্ণু হই, সেটা অর্থনীতির দোষ, আমাদের সংস্কৃতির দোষ নয়।— এই ভাবনাটা মৌলবাদী। এটা থেকে বেরোনো দরকার। তবেই পেট্রোল আর আগুনের ছবি দেখে রাগ হবে না। প্রবল আত্মদহন হবে।

‘ওদের’ সংস্কৃতিটাই অসহিষ্ণু, ‘আমরা’ যুক্তিবাদী। ‘আমরা’ যদি কখনও অসহিষ্ণু হই, সেটা অর্থনীতির দোষ, আমাদের সংস্কৃতির দোষ নয়।— এই ভাবনাটা মৌলবাদী। এটা থেকে বেরোনো দরকার।

ভাড়া কম, বাস নেই

বাসভাড়া না বাড়লে যে বাসযাত্রীদের সুবিধা হয়, এটা বুঝতে অর্থনীতিবিদ হওয়ার দরকার হয় না। টাকা গুনে গুনে খরচ করে যাদের সংসার চালাতে হয়, তারা সবাই জানে। বাজার দরের এই ঊর্ধ্বগতির সময়ে, যেখানে যেটুকু কম হয়, সেটুকুই মধ্যবিত্তের লাভ। কাজেই সরকার যখন সহমর্মিতার কথা বলে নাভিশ্বাস ওঠা মধ্যবিত্তের পাশে দাঁড়ায়, বাসভাড়া না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়, তখন আশা জাগে, বেঁচে থাকা হয়তো একটু সহনীয় হবে। কিন্তু ভাড়া না বাড়িয়েও যদি বাসযাত্রীদের খরচ বাড়িয়ে দেওয়া হয়?

নানা কাজে আমাকে কলকাতা শহরের নানা জায়গায় যেতে হয়। তার মধ্যে সপ্তাহে বেশ কয়েক দিন নিয়মিত একটি রুটে চলাফেরা করতে হয়। আমার বাড়ির কাছ থেকে সেই রুটে একটি সরকারি বাস ছিল। খাতায়-কলমে এখনও আছে। সেই বাসে গন্তব্যে পৌঁছতে আমার এক পিঠের ভাড়া ছিল সাড়ে সাত টাকা। নতুন সরকার আসার আগে পর্যন্ত আমি সাড়ে সাত টাকাতেই যেতাম। তার পর যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে যত সরকারের দৃষ্টি পড়তে লাগল, আমাদের রুটের বাসও কমতে লাগল। এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে দিনে তিনটি বাস চলে কিনা সন্দেহ! আগের মতো সেই এক বাসে যাওয়াটা এখন স্বপ্নাতীত। গোটা রুটটি যদি ভেঙে ভেঙে যাই, তা হলে এগারো থেকে পনেরো টাকা মোটামুটি এক পিঠের ভাড়া পড়ে। এবং তার সঙ্গে বেশ খানিকটা হাঁটা।

এবং সেই ভেঙে ভেঙে যাওয়াটাও আর সম্ভব হচ্ছে না বেশির ভাগ দিন। কারণ, আমি যে রুটটির কথা বলছি, কেবল সেটিই তো নয়, সব রুটের বাসই মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে। কেবল বেয়াদপ বেসরকারি বাস নয়, সুভদ্র সরকারি বাসও। সত্যি কথা বলতে কি, বেসরকারি বাসের আগে সরকারি বাস রাজপথ থেকে উধাও হয়েছে, ফলে বাসস্টপের ভিড় আর কমে না। অনেক অপেক্ষার পর যদি বা একটা এল, ওঠে কার সাধ্য! বাধ্য হয়েই প্রায় প্রতি দিনই ট্যাক্সি নিতে হয়। তার নেট ফল— সাড়ে সাত টাকার রাস্তা পার হতে আমার এখন একশো টাকা লাগছে।

বাসভাড়া বাড়েনি, খুব ভাল কথা। কিন্তু আমার যাতায়াতের বাজেট যে এক লাফে তেরো-চোদ্দো গুণ বেড়ে গেল, তার দায় কে নেবে?

বোলান গঙ্গোপাধ্যায়

এই অধিগ্রহণ আইন চালু হলে উন্নয়ন বিপাকে পড়বে

দেশের জমির বাজারটি কেমন, কেন্দ্রীয় সরকার তার খবর না রেখেই নতুন জমি অধিগ্রহণ আইন বানাতে চলেছে। এই আইন যদি পাশ হয়, তা হলে জমির দাম এমনই বাড়বে যে দেশে শিল্পায়ন ও নগরায়ণ থমকে দাঁড়াবে। লিখছেন সঞ্জয় চক্রবর্তী

জমি অধিগ্রহণের প্রশ্নটি ফের সংবাদ শিরোনামে এসেছে। গত বছর কেন্দ্রীয় সরকার যে জমি অধিগ্রহণ আইনটির প্রস্তাব পেশ করেছিল, তার বিরোধিতা করলেন সরকারেরই বেশ কয়েক জন মন্ত্রী। তাঁদের বিরোধিতার মূল কারণ, এই আইনটি পাশ হয়ে কার্যকর হলে জমির দাম এত বেড়ে যাবে যে দেশে শিল্পায়ন ও নগরায়ণ বাধা পাবে। শিল্প ও বাণিজ্যমহল দীর্ঘ দিন ধরে এই কথাটাই বলছে, কাজেই মন্ত্রীদের আপত্তিতে আশ্চর্য হওয়ার কারণ নেই। সরকারের কথাটা বুঝতে এত সময় লাগল, তাতেই অবাক লাগছে।

দেশের প্রায় সব প্রান্তেই জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে— কোথাও সড়ক প্রকল্পের বিরুদ্ধে, কোথাও বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিরুদ্ধে, এবং বহু জায়গাতেই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরির বিরুদ্ধে। জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে অসন্তোষ কিছু নতুন নয়— নতুন হল ২০০৭ সাল থেকে আরম্ভ হওয়া প্রতিরোধের বিস্ফোরণ।

প্রতিবাদের নানান কারণ রয়েছে এবং দেখানো হয়। তবে, নিঃসন্দেহে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল জমির দাম। স্বাধীন ভারতের সরকার ষাট বছরে প্রচুর জমি অধিগ্রহণ করেছে। ভাকরানাঙ্গাল থেকে ডি ভি সি, রৌরকেল্লা থেকে দুর্গাপুর, সেচ থেকে প্রতিরক্ষা, বিজলি, সড়ক, পানি— সব মিলিয়ে পাঁচ থেকে ছ’কোটি একর জমি অধিগ্রহণ বা বা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন প্রায় পাঁচ কোটি মানুষ, যাঁদের মধ্যে অনেকে হয়ে গিয়েছেন ‘ডেভেলপমেন্ট রিফিউজি’ বা উন্নয়নের উদ্বাস্তু। আর, ক্ষতির প্রধান কারণ— সরকার জমি নিয়েছে জলের দরে। ২০০০ সাল অবধি শয়ে শয়ে একর অধিগ্রহণ করা হয়েছে এক লক্ষ বা তারও কম টাকায়। সরকার দাবি করত, এটাই বাজার দর। বাজার দর দিচ্ছি, তার ওপর ৩০ শতাংশ ক্ষতিপূরণ। এটাই আইন এবং ন্যায্য।

কিন্তু চাষজমির লিখিত ও সত্য বাজার দরের মধ্যে অল্প থেকে অনেক ফারাক থাকে। আদৌ পার্থক্য আছে কি না, থাকলে সেটা কতটা, তার হেরফের আছে রাজ্য থেকে রাজ্যে, অঞ্চল থেকে অঞ্চলে। সরকার আগে স্বীকার করত না, এখন বাধ্য হয়ে করছে।

নতুন জমি অধিগ্রহণ আইন চালু হলে সিঙ্গুরে জমির দাম হবে একরপ্রতি ৭৫ লক্ষ টাকা।

এখন অধিগ্রহণের দাবানল জ্বলে ওঠার পর, অধিগ্রহণ করতে গিয়ে পদে পদে ঠোক্কর খাওয়ার পর, গত বছর এই সময় নাগাদ কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক জমি অধিগ্রহণ নিয়ে একটি বিল প্রস্তাব করে। নাম ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড রিসেটেলমেন্ট বিল, ২০১১ (সংক্ষেপে, এল এ আর আর)। প্রথম ইউ পি এ সরকার আলাদা বিল তৈরি করেছিল অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন নিয়ে, কিন্তু সেই বিল দুটিকে আইন বানাতে পারেনি। সেই বিল দুটি জোড়া দিয়েই তৈরি হয়েছে এই নতুন বিল। বিলটি এক বার মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়ে, পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি ঘুরে ফের মন্ত্রিসভায় এসে আটকে গিয়েছে।

বিলটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দুটো— এক, বেসরকারি স্বার্থে সরকার জমি অধিগ্রহণ করবে কি না; দুই, অধিগৃহীত জমির দাম কী হবে? দ্বিতীয় প্রশ্নটি নিয়ে কিছু কথা বলি। এল এ আর আর অনুযায়ী, যে জমি অধিগ্রহণ করা হবে, প্রথমে তার ‘বাজার মূল্য’ নির্ধারণ করা হবে। গ্রামাঞ্চলে জমির দাম বাবদ দেওয়া হবে বাজার দরের চার গুণ, আর শহরাঞ্চলে দেওয়া হবে দ্বিগুণ। জমির কাগুজে দাম আর প্রকৃত দামের যে ফারাকের কথা একটু আগে বলেছিলাম, এই ব্যবস্থায় তার একটা সমাধান হওয়া সম্ভব। এ ছাড়াও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। যাঁরা জমির মালিক নন, কিন্তু জীবিকার জন্য অধিগৃহীত জমির ওপর নির্ভরশীল, তাঁরাও পুনর্বাসনের সুবিধা পাবেন, কিছু ক্ষতিপূরণ ও ভাতাও পাবেন। এ তো ভাল কথা। তা হলে সমস্যা কোথায়?

ভুল দিয়ে ভুল ঢাকা

সমস্যাটি এই যে সরকার একটি বাজারি আইন বানাতে চায় জমি নিয়ে, কিন্তু জমির বাজার সম্বন্ধে কোনও খবর না রেখে। এই আইন একটা ভ্রান্ত পূর্বধারণার ওপর দাঁড়িয়ে আছে— গোটা দেশের জমির বাজারের একই হাল। এর চেয়ে ভ্রান্ত ধারণা আর হয় না। দেশে এখন মোটামুটি চার রকমের জমির বাজার রয়েছে। প্রথমটি হল ছোট থেকে বড়, সব শহর এবং অধিকাংশ শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকার বাজার। এই বাজারে জমির দাম চড়া বা খুব চড়া এবং কাগুজে আর প্রকৃত দামের মধ্যে কোনও ফারাক নেই। দ্বিতীয়টি হল ছোট শহরের পার্শ্ববর্তী গ্রাম-এলাকার জমির বাজার। এখানে লিখিত আর প্রকৃত দামে সামান্য ফারাক আছে, তবে ক্রমশ সেই ফারাক মুছে যাচ্ছে। তৃতীয় হল সুদূর এবং প্রত্যন্ত গ্রামের জমির বাজার। এই বাজার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনও সীমিত। এখানে লিখিত ও প্রকৃত দামের মধ্যে সম্ভবত অনেকটাই ফারাক আছে— কিন্তু কতটা, তা অজ্ঞাত। আমার অনুমান, এল এ আর আর মূলত এই বাজারের কথা মাথায় রেখেই তৈরি, এবং এই বাজারে আইনটি প্রযোজ্য হলেও হতে পারে। চতুর্থ বাজারটি আসলে বাজার নয়, তা বাজার ব্যবস্থার বাইরে থাকা জমি। এই জমির দাম জানা সম্ভব নয়, কারণ এই জমি বেচা-কেনা হয় না। ওড়িশার নিয়মগিরি পাহাড় এলাকা, যেখানে বেদান্তের প্রকল্প তৈরি নিয়ে বিপুল আলোড়ন হয়েছে, তা এই ধরনের জমির একটা ভাল উদাহরণ।

গত দশ বছরে জমির দাম কী ভাবে বেড়েছে, সরকার তার হিসেব রাখেনি। শহরে জমির দাম বেড়েছে পাঁচ গুণ, গ্রামাঞ্চলে আরও বেশি। জমি অধিগ্রহণ করতে গেলে জমির দাম ছাড়াও আরও খরচ আছে— জমির মালিক এবং জমির ওপর নির্ভরশীল, এই দুই শ্রেণির জন্য পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণবাবদ খরচ। সব মিলিয়ে, এল এ আর আর-এর বিধান মেনে জমি অধিগ্রহণ করতে গেলে এখন যে খরচ পড়বে, তা গ্রামাঞ্চলে ২০০১ সালের তুলনায় প্রায় পঁচিশ গুণ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরও বেশি। শহরাঞ্চলে দাম দাঁড়াবে ২০০১ সালের দামের দশ গুণের এ দিক-ও দিক।

ভারতে সবচেয়ে দামি জমি মুম্বই শহরে। দক্ষিণ মুম্বইয়ে এক একর জমির দাম ২০০ থেকে ২৫০ কোটি টাকা। শহরের একেবারে শেষ প্রান্তে, যেখান থেকে কৃষিজমি আরম্ভ হচ্ছে, সেখানে এক একর জমির দাম ১০ থেকে ১২ কোটি টাকা। দিল্লিতে একরপ্রতি ৭০ থেকে ৮০ কোটি টাকা, কলকাতায় ২৫ কোটি টাকা থেকে ৫ কোটি টাকার মধ্যে। আর, কৃষিজমির দাম অভূতপূর্ব মাত্রায় পৌঁছেছে। ২০০৮ সালে মোহালি বিমানবন্দরের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল একরপ্রতি সওয়া কোটি থেকে দেড় কোটি টাকা দরে। একটি বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য জলাজমি (যাতে চাষ করা যায় না) অধিগ্রহণ করা হয়েছে একরপ্রতি ২০ লক্ষ টাকায়। হরিয়ানাতে একরপ্রতি ৫০-৬০ লক্ষ টাকা দিয়েও জমি অধিগ্রহণ করতে অসুবিধা হচ্ছে নানা প্রকল্পে। গোটা দুনিয়ার মাপকাঠিতে ভারতে জমির দাম খুব ওপরের দিকে।

অন্ধকারে ঢিল

বামফ্রন্ট সরকার সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণ করেছিল একরপ্রতি মোটামুটি নয় লক্ষ টাকায়। বিশেষজ্ঞদের মতে আরও দুই-তিন লক্ষ টাকা দিলে কোনও বিবাদই হত না। এল এ আর আর আইনের হিসাবে সিঙ্গুরের এই জমির দাম তখনই হত একরপ্রতি ৭৫ লক্ষ টাকার কাছাকাছি। আর, সিঙ্গুর থেকে সরানো ন্যানো কারখানা যেখানে গিয়েছে— গুজরাতের সানন্দে— জমির মালিকরা পেয়েছেন একরপ্রতি ৫০ লক্ষ টাকার ওপর। এ জমিতে চাষ করলে বেশি হলে ২০,০০০ টাকা লাভ বা উপার্জন হতে পারে বছরে— দুই পুরুষের চাষে সর্বসাকুল্যে আজকের হিসেবে পাঁচ লক্ষ টাকা। সানন্দে বেশ কিছু জমির মালিক গুজরাতি সিনেমার প্রযোজক হয়ে গিয়েছেন।

গত পাঁচ দশ বছরে দেশের জমির বাজারে একটা আমূল পরিবর্তন হয়েছে। শুধু শহরে নয়, জমির দাম নতুন মাত্রায় পৌঁছেছে শহরের লাগোয়া এবং শহর থেকে দূরের বর্ধিষ্ণু গ্রামাঞ্চলে। এই বাজারে এল এ আর আর একটি চলমান নিশানার দিকে অন্ধকারে ছোড়া ঢিল। এল এ আর আর যদি আইন হয়ে যায় তবে একরপ্রতি, অঞ্চল অনুযায়ী শহরপ্রান্তে জমি অধিগ্রহণের দাম পড়বে আট থেকে চল্লিশ কোটি টাকা; গ্রামাঞ্চলে ২৫ লক্ষ থেকে দেড়-দুই কোটি টাকা। থমকে যাবে বহু উন্নয়নমূলক কাজ, আর তার সঙ্গে শিল্পায়ন ও নগরায়ণ। একটি বড় মাপের বাঁধ ও সেচ প্রকল্পের কথা ভাবুন। জমি লাগবে এক থেকে দুই লক্ষ একর। জমির দাম পড়বে পঁচিশ হাজার কোটি টাকা থেকে দুই লক্ষ কোটি টাকা। এত টাকা কোথায়?

সরকারকে একটা কথা বুঝতে হবে— একটা ভুলের সংশোধন আর একটা ভুল দিয়ে করা যায় না। তা ছাড়া, অন্য উপায় আছে— জমির মালিক এবং জমিহীনদের সুবিচার ও ন্যায় দিয়ে জমি অধিগ্রহণের রাস্তা খোলা রাখার— কিন্তু সে জায়গায় পৌঁছতে ক্ষণস্থায়ী রাজনৈতিক লাভের ঊর্ধ্বে ভাবতে হবে। এই মুহূর্তে, আর কিছু না হোক, এল এ আর আর আইনটি আটকানো দরকার।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেম্পল ইউনিভার্সিটিতে নগরবিদ্যার শিক্ষক